শামসুর রাহমানের কবিতা : আত্মজৈবনিকতা ও আত্মস্বীকারোক্তি

সাবিনা ইয়াসমিন*

[সারসংক্ষেপ : আত্মবিবরণমূলক, আত্মবিবৃতিমূলক এবং আত্মস্বীকারোক্তিমূলক— এই তিনটি কাঠামোর ত্রিকৌণিক মানচিত্রের কেন্দ্রে অবস্থান করে কবির আত্মসত্তা। খুব সূক্ষ্ম কিছু তারতম্যের ভিত্তিতে উল্লিখিত ত্রিমুখী ধারার বিকাশ। অনুভূতির স্বত্বাধিকার কবির একচেটিয়া হলেও যে প্রেক্ষাপটে এইসব অনুভূতির বিকাশ, সেই প্রেক্ষাপটটি কবির একান্ত জগৎ নাও হতে পারে। একইভাবে আত্মবিবরণমূলক কবিতায় কবি ঘটনার ধারা বিবরণকারী— সত্যাসত্য নির্ধারণের ব্যাপারে তিনি এখানে নির্বিকার থাকার অধিকার রাখেন, কেননা যে ঘটনা বা অনুভূতির তন্তু দিয়ে তিনি কবিতার বিবরণী তৈরি করছেন সেটি তাঁর নিজস্ব অভিজ্ঞতার অংশ না হলেও এ ধরনের কবিতা ক্ষতিগ্রস্ত হয় না। কবির আত্ম-অভিজ্ঞতার ভেতরে রসায়িত হয় অনেকের উপলব্ধির সারাৎসার, নিজেকে কেন্দ্রে রেখে তিনি একনিষ্ঠভাবে বর্ণনা করে যেতে পারেন অন্যের জীবনাকাঙ্ক্ষাকে। পঞ্চাশের শক্তিশালী কবি শামসুর রাহমান-এর হাতে উন্মোচিত হয়েছিল রবীন্দ্রনাথসুলভ এক বিপুল কবিতাবিশ্ব। কবিতার নানামাত্রিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার ব্যস্ততায় শামসুর রাহমানের কলমে তৈরি হয় আত্মজৈবনিক ও আত্মস্বীকারোক্তিমূলক কবিতার নতুন ভূমি। আলোচ্য প্রবন্ধে শামসুর রাহমানের কবিতায় আত্মজৈবনিকতা ও আত্মস্বীকারোক্তির স্বরূপ অনুসন্ধানের প্রয়াস থাকবে।]

আত্মবিবরণমূলক, আত্মবিবৃতিমূলক এবং আত্মস্বীকারোক্তিমূলক— এই তিনটি কাঠামোয় বিন্যস্ত কবির আত্মপরিক্রমার মানচিত্র। ত্রিকৌণিক এ মানচিত্রের কেন্দ্রে প্রাণভ্রমরা স্বরূপ অবস্থান করে কবির আত্মসত্তা। খুব সূক্ষ্ম কিছু তারতম্যের ভিত্তিতে এই ত্রিমুখী ধারার বিকাশ। আত্মবিবরণমূলক কবিতার অন্তর্বয়ন-কৌশল গীতিকবিতারসঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ। গীতিকবিতার বিকাশ ঘটেছিল আত্ম-অভিজ্ঞান অবলম্বনে, যেখানে কবির কণ্ঠে ধারণকৃত আনন্দ-বেদনা, প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তি, আশা-নৈরাশ্যের প্রকল্প তৈরি হয় পারিপার্শ্বিক থেকে সঞ্চিত অভিজ্ঞতার স্তরায়নে। অনুভূতির স্বত্বাধিকার কবির একচেটিয়া হলেও যে প্রেক্ষাপটে এইসব অনুভূতির বিকাশ সেই প্রেক্ষাপটটি কবির একান্ত জগৎ নাও হতে পারে; একইভাবে আত্মবিবরণমূলক কবিতায় কবি ঘটনার ধারা বিবরণকারী— সত্যাসত্য নির্ধারণের ব্যাপারে তিনি এখানে নির্বিকার থাকার অধিকার রাখেন, কেননা যে ঘটনা বা অনুভূতির তন্তু দিয়ে তিনি কবিতার বিবরণী তৈরি করছেন সেটি তাঁর নিজস্ব অভিজ্ঞতার অংশ না হলেও এ ধরনের কবিতা ক্ষতিগ্রস্ত হয় না। কবির আত্ম-অভিজ্ঞতার ভেতরে রসায়িত হয় অনেকের উপলব্ধির সারাৎসার, নিজেকে কেন্দ্রে রেখে তিনি একনিষ্ঠভাবে বর্ণনা করে যেতে পারেন অন্যের জীবনাকাঙ্ক্ষাকে অবিচল। অন্যদিকে আত্মবিবৃতিমূলক কবিতার ভেতরে জমাটবদ্ধ আবেগ-অনুভূতি-অভিজ্ঞান সবকিছুর জন্য কবির একার দায়, সর্বজনীন চেতনা প্রকাশের সুযোগ এ ধরনের কবিতায় নেই, 'বিবৃতি' শব্দটি নির্দেশ করে সত্যনিষ্ঠতাকে, যার ফলে আত্মবিবৃতিমূলক কবিতা হয়ে ওঠে কবির জীবনকেন্দ্রিক, আত্মজৈবনিক। আবার কবিতা যখন আত্মস্বীকারোক্তিমূলক, তখন তা অতিক্রম

*সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়।

করে আত্মজৈবনিকতার সীমা; কবির অবদমনে, অবচেতনে যে অনুভূতির জন্ম, যাকে গোপনতম ভাবাবেগ বলে নির্দেশ করলেও অত্যুক্তি হয় না, সেই ধরনের অনুভূতি এবং যাপিত জীবনের নানারকম বিকার ও বিবিক্তি যা কবির একান্ত ব্যক্তিগত, সেসব বিষয় কবিতায় স্বীকার করার মাধ্যমে জন্ম হয় আত্মস্বীকারোক্তিমূলক কবিতা : 'স্বীকারৌক্তিক কবিগোত্র, জীবনে-কবিতায়, উন্মাদ ও আত্মহননপ্রবণ; এবং অনেকে সফল আত্মঘাতী। তাঁদের সাধারণ ধর্ম মনোবৈকল্য, যার উৎসারণ তাঁদের কবিতা। কবিতাকে ব্যক্তিগত জীবনের ঘটনা ও কাহিনীতে না সাজিয়ে তাঁরা জীবনপঞ্জিকেই ক'রে তুলছিলেন কবিতা' (আজাদ, ১৯৮৩ : ২৩)। এ কবিতার ইংরেজি প্রতিশব্দ এবং ইতিহাসের দিকে তাকালে দেখা যায় যে, 'কনফেশন' নামক এক ধর্মীয় পরিভাষাকে উপজীব্য করে পঞ্চাশের দশকের বিশ্বকবিতায় এর বিকাশ। 'কনফেশন' শব্দের উৎস খ্রিস্ট ধর্ম তথা উপাসনালয়, যেখানে ঈশ্বরের সেবক কোনো একজন যাজকের উপস্থিতিতে মানুষ তাঁর জাগতিক পাপের স্বীকারোক্তি প্রদান করে, বিশেষ করে মৃত্যুর পূর্বে কনফেশনের প্রবণতা খ্রিস্টধর্মানুসারীদের মধ্যে প্রবল। স্খলিত মানবসত্তা নির্মলরূপে পরমসত্তার সঙ্গে একীভূত হবার আকাঙ্ক্ষা থেকে যাবতীয় কৃতকর্ম ও পাপের স্বীকারোক্তি প্রদান করে, পঞ্চাশের দশকে একদল আমেরিকান কবি এই ধর্মীয় পরিভাষাটিকে রূপান্তর করে প্রয়োগ করলেন একটি বিশেষ কবিতাধারাকে চিহ্নিতকরণে। এই ধারার কবিরা নিজের একান্ত পতন, স্খলন, মানসিক বিকার এবং ব্যক্তিগত ও পারিবারিক জীবনের নানা প্রান্ত উন্মুক্ত করে দিলেন কবিতার চরণগুচ্ছে। পঞ্চাশে বিশ্বকবিতায় সৃষ্ট এ ধারাটির শক্তিশালী এবং ধারাবাহিক কোনো অনুরণন বাংলা কবিতাধারায় পাওয়া যায় না, তবে বিচ্ছিন্নভাবে পঞ্চাশ ও ষাটের দশকের অনেক কবির কবিতায় রয়েছে আত্মস্বীকারোক্তি প্রবণতার অস্তিত্ব।

সাধারণত 'আমি' সর্বনামের ভেতরে কেন্দ্রীভূত হয় আত্মজৈবনিকতা ও আত্মস্বীকারোক্তি। বাংলা কবিতায় কাজী নজরুল ইসলামই প্রথম 'আমি'র ব্যাপক ব্যবহার করেন 'বিদ্রোহী' কবিতায়, তাঁর পুনরাবৃত্ত 'আমি' আত্মবিবরণের অংশ–আত্মজৈবনিকতা বা আত্মস্বীকারোক্তির নয়। নজরুলের 'আমি'র ভেতরে কেন্দ্রীভূত আর্থ-সমাজ, পুরাণ ও রাজনীতি; এই 'আমি' তাঁর কবিসত্তারও প্রতিনিধি। তিরিশের কবিদের দুটি বিশেষ প্রবণতা– একটি সৃষ্ট হয়েছিল বিহারীলাল-রবীন্দ্রনাথ ও বিশ্বকবিতার সমন্বয়ে, অন্যটি নজরুল এবং সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের অভিঘাতে। এ পর্বের আধুনিক কবিতার চারিত্র্য ছিল নৈর্ব্যক্তিক প্রকাশ, ব্যক্তিসত্তায় সঞ্চিত যুগের ক্লান্তি, যুগের হতাশ্বাস কবিতায় জমে উঠেছিল চিরন্তন মানবাত্মার আর্তনাদ হয়ে। সমাজবাদী কবিতা সমষ্টির প্রতি দায়বদ্ধতার কারণে বলেছিল 'আমরা' অথবা 'আমাদের' কথা, কখনো 'আমি' সেখানে উপস্থিত হলেও এই 'আমি'র ভেতরে কেন্দ্রীভূত হয়েছিল সমাজকাঠামোর অসম বিন্যাস ও শ্রেণিচেতনার যূপকাষ্ঠে পতিত অগণিত মানুষের অভিজ্ঞান, সমর সেনকে সুতীব্র সমালোচনায় বিদ্ধ করতে দেখি নিজের মধ্যবিত্ত সত্তাকে, যে সত্তা কোনো একক অস্তিত্ব নয় বরং শ্রেণিচরিত্রের অংশ। দেশবিভাগোত্তর বাংলাদেশের কবিতা পূর্বজ ধারানুযায়ী গীতিকবিতা ও সমাজ-সচেতন কবিতার দ্বৈরথে নতুন ভূখণ্ডে যাত্রা শুরু করে; অন্যদিকে চল্লিশের দশকে পাকিস্তানি জাতীয়তাবাদ সৃষ্টির প্রয়োজনে ফররুখ আহমদের হাতে ইসলামি ঐতিহ্য-চেতন যে কবিতাধারা সৃষ্টি হয় তারই চর্চা অব্যাহত রাখেন একদল কবি, ফলে বাংলা কবিতার ভেতরে জন্মায় ত্রিধাবিভক্তি। বায়ান্নর ভাষা-আন্দোলন পরবর্তীকালে বাঙালি জাতীয়তাবাদের প্রবল পরাক্রমের মুখে তৃতীয় কাব্যধারাটি অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার

যৌক্তিকতা হারিয়ে ফেলে ক্রমশ। বাংলাদেশের কবিতার প্রধানতম দুটি প্রবণতার মধ্যে সমাজবাদী কবিতায় 'আমি'র আধিপত্য সৃষ্টি অসম্ভব ছিল, কেননা এ ধরনের কবিতার জন্ম হয়েছিল মার্কসবাদ-লেনিনবাদে স্নাত হয়ে, যেখানে শ্রেণি-সচেতনতাই শিল্পসৃষ্টির মৌল প্রেরণা। গীতিধর্মী কবিতার যে ধারাটি অবশিষ্ট রইল, সেখানে আত্মজৈবনিক এবং আত্মস্বীকারোক্তি-মূলক কবিতাসৃষ্টির সম্ভাবনা-ক্ষেত্র ছিল, সেই সম্ভাবনা কোনো কোনো কবির হাতে বাস্তবরূপ লাভ করেছে। দেশবিভাগোত্তরকালে পঞ্চাশের প্রতিনিধিত্বশীল বাংলা কবিতায় যারা নেতৃত্ব প্রদান করেন, হাসান হাফিজুর রহমান তার মধ্যে অন্যতম। তিনি স্বদেশ ও সমকাল তাড়িত এবং শ্রেণিবৈষম্য-পীড়িত কবি, ফলে তাঁর কবিতায় আত্মমগ্নতার তুলনায় স্বদেশ ও সমকাল প্রাধান্য পেয়েছে। পঞ্চাশের আরও একজন শক্তিশালী কবি শামসুর রাহমান, যার হাতে উন্মোচিত হয়েছিল রবীন্দ্রনাথসুলভ এক বিপুল কবিতাবিশ্ব। কবিতার নানামাত্রিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার ব্যস্ততায় শামসুর রাহমানের কলমে তৈরি হয় আত্মজৈবনিক ও আত্মস্বীকারোক্তিমূলক কবিতার নতুন ভূমি। পঞ্চাশের শেষ লগ্নে বাংলা কবিতায় খোদিত হয় আরেকটি নাম– শহীদ কাদরী, তাঁর কবিতায় আধুনিক নাগরিক যন্ত্রণাবোধ ছিল, নৈরাশ্যকাতরতা অনেক সময় আত্মজৈবনিকতা ও আত্মস্বীকারোক্তিতাড়িত হয়ে কবিতারূপ পেয়েছিল; এছাড়া আল মাহমুদ, সৈয়দ শামসুল হক, রফিক আজাদ, নির্মলেন্দু গুণ, মহাদেব সাহা, আবুল হাসানের কবিতায় এই প্রবণতা ক্রিয়াশীল ছিল। দেশবিভাগোত্তর অস্থিতিশীল দেশ-কালের ভেতরে আত্মরতি বা আত্মসত্তার গহিনে ডুব দিয়ে কবিতার পথ নির্মাণ ছিল দুরূহ কাজ, তারচেয়ে সহজ ছিল ঘটমান বর্তমান থেকে কবিতার উপাদান সংগ্রহ। বাংলাদেশের কবিরা সচেতনভাবে, আবার অনেকে ঘটনাচক্রে জড়িয়ে গিয়েছিলেন রাজনৈতিক বাস্তবতার সঙ্গে, ফলে তাদের কবিতায় সবচেয়ে বেশি শোনা যায় সমকালের নিনাদ। তুলনামূলকভাবে পশ্চিমবাংলার পরিস্থিতি ছিল স্থিতিশীল, ফলে সেখানে কবির ব্যক্তিসত্তার নানামাত্রিক উন্মোচন সম্ভব হয়েছিল, আত্মজৈবনিক ও আত্মস্বীকারোক্তিমূলক কবিতার জন্য তাঁরা পেয়েছিলেন সুবর্ণ অবকাশ। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর কবিতা প্রসঙ্গে বলেছিলেন : 'আমার প্রতিটি কবিতাই আমার জীবনযাত্রার প্রতিফলন, সেই জন্যেই আমি একাধিক জায়গায় বলেছি, আমার কবিতাগুলি স্বীকারোক্তিমূলক। শামসের আনোয়ার, ভাস্কর চক্রবর্তী, বেলাল চৌধুরী প্রমুখ কবির কবিতা অনেক সময় পেয়েছে আত্মজৈবনিক ও আত্মস্বীকারোক্তিমূলক কবিতার চারিত্র্য : 'আত্মজৈবনিকতার সূত্রপাত ঘটেছিল পশ্চিম বাংলায় পঞ্চাশের দশকে এটা যেমন সত্য, তেমনি বাংলাদেশের পঞ্চাশের কবিদের সহযোগিতায় ষাটের কবিরাই তাকে নানাভাবে করে তুলেছেন অনেক বেশি প্রাগ্রসর' (মাসুদুজ্জামান, ১৯৯৩ : ২৬৭)।

বাংলাদেশের কবিতাধারায় শামসুর রাহমান বহুপ্রসূ কবি, সংখ্যাতাত্ত্বিক বিচারে তিনি স্পর্শ করতে সক্ষম হন কবি রবীন্দ্রনাথের পরিসংখ্যানকে। ষাটের অধিক কাব্যগ্রন্থের বিষয়বিন্যাসে তিনি বহুমাত্রিক, জীবনের নানা প্রান্ত থেকে সঞ্চিত অভিজ্ঞতা কেন্দ্রীভূত হয়েছে তাঁর কবিতায়। কবির সৃষ্টিশীল সত্তা, কবির যাপিত জীবন, কবিতার নির্মাণপ্রক্রিয়া– কবি ও কবিতাসংক্রান্ত ইত্যাকার বিষয়ের পুনরাবৃত্তি নিয়ে মুখর তাঁর কবিতার প্রেক্ষাপট, এ বিষয়ে তিনি বিরলপ্রজ, বাংলাদেশের অন্য কোনো কবির কলমে আত্মপ্রতিকৃতি অঙ্কনের স্পৃহা এত প্রবলভাবে ধরা পড়েনি : 'আত্মকেন্দ্রিকতা ও আত্মকথনে তিনি বাংলা ভাষায় সম্ভবত অদ্বিতীয়; –আপন প্রসঙ্গ, অনুষঙ্গ, ব্যক্তিগত জীবন ও প্রতিবেশ, আত্মীয়-বান্ধব এবং নিজের সাথে সম্পর্কিত প্রায়-সমস্ত কিছু ঢুকেছে তাঁর কবিতায়' (আজাদ, ১৯৮৩ : ২২)।

শামসুর রাহমানের যাপিত জীবন এবং কবিজীবনের মধ্যে ব্যবধান ছিল সূক্ষ্ম, যাপিত জীবনকে তিনি গচ্ছিত রেখেছেন তাঁর কাব্যের অন্তরালে, তবে এই গচ্ছিত রাখার প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন হয়েছে নানা রকমে– কখনো পারিপার্শ্বিকতা থেকে সঞ্চিত অভিজ্ঞতার কেন্দ্রে নিজেকে প্রতিস্থাপন করে লিখেছেন বিবরণধর্মী কবিতা, কখনো তাঁর নিজস্ব জীবনাভিজ্ঞতা ও আত্মপ্রতিকৃতির ভেতরে পুঞ্জীভূত হয়েছে পারিপার্শ্বিক, আবার কখনো নিজের জীবনের নানা সংকট, ব্যর্থতা ও মানসিক বিকার পরিণত হয়েছে আত্মস্বীকারোক্তিতে। জীবনের শেষপ্রান্তে এসে তিনি সমালোচক-প্রকাশক-শুভানুধ্যায়ীদের দ্বারা অনুরুদ্ধ হয়ে প্রণয়ন করেন আত্মজীবনী-মূলক গদ্যগ্রন্থ *কালের ধুলোয় লেখা*, আত্মজীবনীটি গ্রন্থাকারে প্রকাশ পায় ২০০৪ সালে, কবির জীবনাবসানের মাত্র দুবছর পূর্বে। *কালের ধুলোয় লেখা*তে যে শামসুর রাহমানকে আবিষ্কার করা সম্ভব হয়, সেটি তাঁর কেনো অভিনতুন প্রতিকৃতি নয়, এই আত্মপ্রতিকৃতি এবং আত্মপরিক্রমার সঙ্গে পাঠকের পূর্বপরিচয় ঘটে গিয়েছিল কবিতার সুবাদে। তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন পুরোনো ঢাকায়, এ প্রসঙ্গে আত্মজীবনীতে তাঁর বিবৃতি : '... ১৯২৯ সালে আমি সর্বপ্রথম পৃথিবীর আলো দেখেছিলাম পুরোনো ঢাকার মাহুৎটুলির এক সরু গলির ভেতর, আমার নানার কোঠাবাড়িতে। কোঠাবাড়ি বলে দিচ্ছে, রূপোর চামচ মুখে নিয়ে আমি জন্মগ্রহণ করিনি' (রাহমান, ২০০৪ : ৯)। উদ্ভট *উটের পিঠে চলেছে স্বদেশ* কাব্যগ্রন্থের 'সে এক মাটির ঘর' কবিতায় তিনি মাহুৎটুলির সেই সরু গলি এবং কোঠাবাড়িটিকে নির্দেশ করে বলেন : 'আমি ভূমিষ্ঠ হয়েছিলাম এই শহরের অখ্যাত গলির/ এক মাটির ঘরে'। গদ্যে তিনি নিজের যাপিত জীবনের সত্যনিষ্ঠ ভাষ্য একনিষ্ঠতার সঙ্গে উপস্থাপন করেছেন, একইভাবে কবিতাতেও তিনি বিরামহীনভাবে লিপিবদ্ধ করেছেন তাঁর ব্যক্তিগত ও পারিবারিক জীবনের নানা চালচিত্র। আত্মজীবনীতে উল্লিখিত 'রূপোর চামচ মুখে নিয়ে' জন্মাননি এই প্রবাদপ্রতিম বাক্যটি নির্দেশ করে কবির পরিবারের অর্থনৈতিক অবস্থাকে, 'আত্মচরিত' কবিতায় বিষয়টিকে আরও স্পষ্ট করেন এভাবে :

> উনিশ শো ঊনত্রিশ সালে অক্টোবরে
> জন্মেছি ঢাকায় আমি ছায়াচ্ছন্ন গলির ভেতরে
> ভোরবেলা নিম্নমধ্যবিত্ত মাতামহের নিবাসে।
> (*এক ফোঁটা কেমন অনল*)

নিজের অর্থনৈতিক অবস্থার বিবৃতি প্রদানে তিনি অকুণ্ঠ, এ কারণে নির্দ্বিধায় তিনি স্বীকার করেন মাটির কোঠাবাড়ি এবং নিম্নমধ্যবিত্ত অবস্থানের বাস্তবতা। 'রূপোর চামচ মুখে নিয়ে' না জন্মানোর রূঢ়-সত্য তাঁর পরবর্তী জীবনের নকশা বদলে রেখেছে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। তিনি শৈশবেই আলোড়িত হয়েছিলেন চিত্রশিল্পের রঙিন কলা-কাঠামো দেখে, বিশেষ করে ইমাম হোসেনের 'দুলদুল' ঘোড়া, যে ঘোড়াটি কারবালা প্রান্তরে তীরবিদ্ধ হয়েছিল। রক্তাক্ত 'দুলদুল' পরিণত বয়সেও তাঁর কবিমানসকে আবেগের ঝড়ে কম্পিত করেছে, অনেক কবিতায় লিপিবদ্ধ হয়েছে বিক্ষত দুলদুলের চিত্রকল্প, 'দুলদুল' কবির আত্মজৈবনিকতার এক বিশেষ অংশ। পুরোনো ঢাকার তৎকালীন বাবু বাজারের সস্তা ছবির দোকান ও নিম্ন আয়ের ছন্নছাড়া শিল্পীদের দেখে তিনি চিত্রশিল্পী হওয়ার জন্য সংকল্পবদ্ধ হন। শেষাবধি কবির চিত্রশিল্পী হওয়ার সংকল্প বাস্তবায়িত হয়নি, তাঁর প্রথম পেশাজীবনের শুরু বেকার জীবনের হতাশার নিষ্পেষণ থেকে, জীবনবাস্তবতার প্রয়োজনে সাংবাদিক আর আন্তর-খোরাকের প্রয়োজন থেকে তিনি হলেন কবি। যদিও কবির পিতা ছিলেন কবিতাচর্চার বিপক্ষে, তার একান্ত ইচ্ছা ছিল পুত্রকে কোনো

জাদরেল পেশাজীবীর ভূমিকায় দেখার, কিন্তু শামসুর রাহমানের শিল্পগ্রাহী মন জাগতিক জীবনের সুখ-সম্ভাবনার দ্বার রুদ্ধ করে বেছে নিয়েছিল শিল্পসৃষ্টির দুর্গম ও যন্ত্রণাকাতর পথ :

এবং আমার কথা ছিল
ছবি আঁকবার,
যদিও আমার জনকের বিবেচনা
ছিল বিপরীত কিছু, ভাবতেন তিনি স্বপ্নঘোরে –
আমি হবো জেলা ম্যাজিস্ট্রেট।

('এতদিনে জেনে গেছি', *নায়কের ছায়া*)

সহজাত শিল্পবোধ থেকে তিনি উপলব্ধি করেন এক নিগূঢ় সত্য– শিল্পের কোনো জাত-পাত নেই, সব শিল্পই প্রাণকে সঞ্জীবিত করে বিপুল প্রাণরসে, শিল্পের অমরাবতীতে প্রবেশের জন্য একেকজনের সামনে খুলে যায় একেকটি দরোজা, তাই শৈশবের সংকল্পকে তিনি বাস্তবরূপ দেন কবিজীবনের ঐকান্তিকতায় : 'আমি ছবি লিখি অক্ষরে অক্ষরে' ('এতদিনে জেনে গেছি', *নায়কের ছায়া*)। শামসুর রাহমানের কবিতাচর্চার প্রতি তাঁর পিতার বিরুদ্ধাচারণ এবং বিপ্রতীপ অবস্থানের সংবাদ পাওয়া যায় আরও কিছু উৎস থেকে : 'শামসুর রাহমানের বাবা শামসুর রাহমানের কবিতা লেখা খুব অপছন্দ করতেন। তিনি চাইতেন শামসুর রাহমান সিএসপি দিক বা ব্যারিস্টারি পড়ে আসুক বা বিজনেসে বসুক। শামসুর রাহমান কোনোটাতেই রাজী হননি' (জ্যোতিপ্রকাশ, ২০১৬ : ১০৫)। কর্মজীবন যেন তাঁর কবিসত্তাকে গ্রাস করতে না পারে সেজন্য তিনি বাবার ইচ্ছার বিরুদ্ধে পেশাজীবন তৈরি করেন, শিল্পবান্ধব পেশা বিবেচনায় তিনি সাংবাদিকতার সঙ্গে যুক্ত হন। পরবর্তীকালে স্বদেশ, সমকাল ও ব্যক্তিগত বিপর্যয়ের মুখোমুখি কবি উপলব্ধি করেন শিল্পের সুষমা দিয়ে সমাজ-পরিবর্তন অথবা দুঃসময়কে শাসন অসম্ভব, এক বিফল কবির আর্তনাদসত্তায় ধারণ করে তিনি পিতার সেই অমোঘ বাণী স্মরণ করে বলেন :

তোমার কথাই ঠিক আব্বা, তোমার কথাই ঠিক–
আমার সকল বেলা বিফলে গিয়েছে নিশিদিন।
দাঁড়িয়ে রয়েছি একা নিরুপায়, অশ্বেতর আর
গাধার ব্যাপক খুরে হচ্ছে পিষ্ট, হায়, ধ্রুবপদ।

('তোমার কথাই ঠিক', *আমি অনাহারী*)

শামসুর রাহমানের জন্ম ও বেড়ে ওঠা রক্ষণশীল পারিবারিক গণ্ডিতে, শিল্পের সুবাতাস তাঁর পারিবারিক আবহে কোনোদিন অবাধে প্রবেশ করতে পারেনি, 'সে এক মাটির ঘর' কবিতায় জন্মবৃত্তান্তের সময় সে-কথা জানিয়ে দেন তিনি অকপটে। পারিবারিক রক্ষণশীলতার বাইরে উন্মুক্ত ছিল পুরোনো ঢাকার জনজীবনের বিশালতা; মেরাসীনদেন গান, ভিস্তিওয়ালা, বাতিওয়ালা, জীর্ণ ঘোড়া-সহিস-আস্তাবল, হার্নি সাহেবের বাড়ি, মর্নিং স্কুল, চিন্তাহরণ মাস্টার – শামসুর রাহমানের মানসগঠনে শক্তিশালী ভূমিকা রেখেছিল। পরবর্তীকালের ঢাকা কলেজ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আমতলা, মধুর ক্যান্টিন এবং নিজের গ্রাম পাড়াতলীর পিছুটান– এসবই কবিতায় চিত্রিত হয়েছে আত্মজৈবনিকতার অংশ হিসেবে।

শামসুর রাহমানের আত্মজৈবনিক কবিতার তালিকা দীর্ঘ– পুরোনো ঢাকা এবং বুড়িগঙ্গা নদীর স্মৃতিকাতরতা নিয়ে লেখেন 'শহুরে সংলাপ' (*ছায়াগণের সঙ্গে কিছুক্ষণ*), কালের আঘাতে পরিবর্তিত চিরচেনা ঢাকার চারিত্র্য বদলেছে কবির চোখের সামনে। 'রোমান্টিক বেদনা আর বিপন্ন অস্তিত্বের পাশাপাশি শামসুর রাহমান আত্মপ্রতিকৃতি অঙ্কনে কখনো চলে গেছেন নস্টালজিয়া-আক্রান্ত পুরানো ঢাকার স্মৃতিময় শৈশবে' (ঘোষ, ২০১০ : ১২৩)। পুরোনো ঢাকার নানা অনুষঙ্গ তাঁর কবিতার বিষয় হিসেবে বিন্যস্ত হয়েছে, আত্মজৈবনিক কবিতার রসদ জুগিয়েছে :

সন্ধ্যার গলির মোড়ে কাঁধে মই বওয়া বাতিওয়ালা,
হার্নি সাহেবের হল্‌দে পুরোনো দালান,
খড়বিচালির গন্ধভরা মশা-গুঞ্জরিত
বিমর্ষ ঘোড়ার আস্তাবল, মেরাসীনদের গান
ধরে আছে সময়ের সুদূর তরঙ্গমেশা আমার শৈশব।
('দশ টাকার নোট এবং শৈশব', *যে অন্ধ সুন্দরী কাঁদে*)

'তোমাকে ঘিরে আমার কোনো কোনো সাধ' (*তুমি নিঃশ্বাস তুমি হৃদস্পন্দন*), 'ওরা চলে যাবার পর' (*আমার ক'জন সঙ্গী*) কবিতার প্রেক্ষাপটে রয়েছে কবির নিজ গ্রাম পাড়াতলী; কবির শেষ বয়সের দয়িতা, প্রেরণাদাত্রী 'গৌরী' এবং প্রিয় মোমেনা খালাসহ পারিবারিক জীবনের অনেক ব্যক্তি ও ঘটনা হুবহু সংগ্রহ করেছেন নিজের জীবন থেকে উল্লিখিত কবিতাদ্বয়ে। শামসুর রাহমান ছিলেন ঢাকা কলেজের ছাত্র, নস্টালজিয়া আক্রান্ত কবির 'ঢাকা কলেজকে নিবেদিত পঙ্‌ক্তিমালা' (*ছায়াগণের সঙ্গে কিছুক্ষণ*)। কবিতাটিতে তরুণ ছাত্রদের মানসগঠনে ঢাকা কলেজের ভূমিকাকে ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। অসুস্থ কবির হাসপাতালে ভর্তি এবং অস্ত্রোপচার-পরবর্তী প্রতিক্রিয়া নিয়ে রচনা করেন 'অস্ত্রোপচারের পরে' (*খুব বেশি ভাল থাকতে নেই*)। আধো-ঘুম, আধো-জাগরণের ভেতর যেসব চিত্রকল্প খেলা করে কবির চৈতন্যে তারই আবহ ফুটে উঠেছে কবিতাটিতে : 'স্যালাইন নল দ্রাক্ষালতা,/ মদির জীয়ন রস চুঁইয়ে চুঁইয়ে পড়ে শিরায়; কে আছে/ দাঁড়িয়ে শিয়রে নাগা সন্ন্যাসীর মতো?' জীবনের বিচিত্র ধরনের অভিজ্ঞতাকে কাব্যরূপ দেবার অভিপ্রায় থেকে তিনি চলার পথের দৃশ্যাবলি, দিনযাপনের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র বিষয়গুলোকেও সযত্নে লালন করেন এবং সময় বিশেষে সেই অভিজ্ঞান প্রয়োগ করেন কবিতায়। 'একটি প্রশ্ন' (*মানব হৃদয়ে নৈবেদ্য সাজাই*) কবিতাটি তিনি লিখেছিলেন ফ্লোরিডার কিসিমি শহরে বসে, এ কবিতায় মেজো কন্যা ফাওজিয়াসহ পরিবারের অন্যান্য সদস্যরা এসেছে নাম-পরিচয়সহ, মূলত কবি এখানে মৃত্যুচিন্তার রূপকার। এ কাব্যের 'একটু পরেই যাত্রা' কবিতাটিও কিসিমি শহরের প্রেক্ষাপটে রচিত।

বেদনা থেকে আদি কবিতার জন্ম, শামসুর রাহমানের সৃজনশীলতার সূচনাও ছোটো বোন নেহারের মৃত্যুজনিত বেদনার আঘাতে। 'কোমল গান্ধার' কবিতায় বলেন : 'স্ফটিক সকালবেলা সে কী জন্ম কান্না দশদিক/ জাগানো আমার–' (*মঞ্চের মাঝখানে*)। এই কান্নার সূত্রে জানা যায় একজন শিল্পীর জন্মকথা, 'কোমল গান্ধার' কবিতাটি শিল্পী হিসেবে শামসুর রাহমানের জন্ম এবং ছোটো বোন নেহারের মৃত্যুর দ্বৈরথে বাঁধা। এভাবে ব্যক্তিগত বেদনা-মন্থনে, প্রিয়জনের বিয়োগ-ব্যথার কাতরতা নিয়ে যে কবির যাত্রারম্ভ, তাঁর কবিতাভূমিকে আমৃত্যু উর্বরতা দিয়েছে

আত্মজৈবনিক চেতনা, কবিতার শরীরজুড়ে তিনি ছড়িয়ে দেন আত্মজৈবনিকতার ঘ্রাণ। পরিবারের কোনো সদস্য বা তাঁর নতুন কোনো কবিতার জন্মের আনন্দ, কারও মৃত্যুর বিষাদ অথবা কবিতা লিখতে না-পারাজনিত ব্যর্থতা, স্বদেশ-সমকালের নানা ঘটনা, বিদেশ যাত্রা– নানা ঘটনাকে কেন্দ্র করে তাঁর কবিতা পেয়েছে গতি। পিতা-মাতা, ভাই-বোন, স্ত্রী-পুত্র-কন্যা-পৌত্র-পৌত্রী সবাইকে ঘিরে যে পারিবারিক জীবনবলয়, সেই বলয় ঘুরেও কবিতা সংগ্রহ করেছে তার বিষয়, যদিও আবেগমথিত এসব ব্যক্তিগত উচ্চারণ অনেক সময় ছাড়িয়েছে শিল্পের সীমা।

এক অর্থে সব কবিতাই আত্মজৈবনিক, পারিপার্শ্বের যাবতীয় অভিজ্ঞতা কবির চেতনায় সঞ্চিত হয়, তাঁর অনুভূতির রসায়নে আহরিত অভিজ্ঞতা রূপান্তরিত হয় কবিতায়। এ কারণে কবিতায় রেখায়িত অনুভূতিমালার কোনোটি কবির নিজস্ব, আর কোনোটি অন্যের জীবন থেকে সংগৃহীত সে-বিষয়ে দ্বিধা থেকে যায়, এই দ্বিধা ও রহস্যঘনতার ভেতরে বেঁচে থাকে কাব্যের প্রাণ, না হলে কবিতা পর্যবসিত হতো সাধারণ দিনযাপনের আলাপে। শামসুর রাহমানের আত্মজৈবনিক কবিতার আর একটি বড়ো উপকরণ মৃত্যু; রবীন্দ্রনাথ প্রত্যক্ষ করেছিলেন প্রিয় মানুষগুলোর মৃত্যু, নিজের মৃত্যুর বাস্তবতাকে তিনি রোমান্টিক চেতনায় মুড়ে বলেছিলেন 'মরণ রে তুহু মম শ্যামসমান', শামসুর রাহমানের কবিসত্তাও তেমনি অনেক প্রিয়জন-বিয়োগের বেদনায় স্নাত, তবে মৃত্যুকে তিনি ভীতিকর এবংরুদ্ধদ্বার চেতনার অন্ধকার হিসেবেই দেখেছেন, মৃত্যু নিয়ে নেই তাঁর কোনো রোমান্সঘন উপলব্ধি। ছোটো বোন নেহারের মৃত্যুর পর আরেকটি মৃত্যু শামসুর রাহমানকে ব্যাপকভাবে আন্দোলিত করে– তাঁর প্রিয় পুত্র মতিনের মৃত্যু। মতিনকে নিয়ে তিনি একাধিক কবিতার জন্ম দিয়েছেন, যেখানে শিল্পিতা পেয়েছে এক শূন্য পিতৃহৃদয় :

এ আমার ছোটছেলে, যে নেই এখন,
পাথরের টুকরোর মতন
ডুবে গেছে আমাদের গ্রামের পুকুরে
বছর তিনেক আগে কাকাডাকা গ্রীষ্মের দুপুরে।

('একটি ফটোগ্রাফ', *এক ফোঁটা কেমন অনল*)

অনুতাপের উত্তাপে উষ্ণ এই উচ্চারণ, মানসিক ভারসাম্যহীন মতিনকে গ্রামে নিরাময়ের প্রত্যাশায় পাঠিয়ে দেওয়ার ভুল সিদ্ধান্ত কবিকে রক্তাক্ত করেছে। পাড়াতলী গ্রাম ও পুকুরসংক্রান্ত স্মৃতিকাতরতার সঙ্গে প্রাপ্তির আনন্দ ও হারানোর বেদনা যুগপৎ জড়িত, লেন-দেনের এক অদ্ভুত বৈপরীত্য নিয়ে কবির স্মৃতিতে উদ্ভাসিত পাড়াতলীর পুকুর :

মনে পড়ে
একাত্তরের এপ্রিলে দুপুরে
কবিতা লিখেছিলাম নাক্ষত্রিক আলোড়নে আর
এই পুকুরের পিপাসার্ত জল আমার অসুস্থ
আত্মজকে অনুরূপ দ্বিপ্রহরে করেছিল গ্রাস।

('বহুদিন পর পাড়াতলীতে আবার', *টুকরো কিছু সংলাপের সাঁকো*)

শামসুর রাহমানের কবিতার আরেকটি প্রভাববিস্তারী চরিত্র কবির মা। মাকে নিয়ে শামসুর রাহমান অনেক কবিতা লিখেছেন, কখনো সে মা দেশের প্রতিকল্প, কখনো মমত্বের চিরন্তন প্রতিরূপ, কখনো আবার কবির ব্যক্তিজীবনকে ঘিরে থাকা জন্মদাত্রীর প্রতিচ্ছবি। শহীদ কাদরী 'অগ্রজের উত্তর' কবিতায় প্রতিবিম্বিত হয়েছিলেন বড়ো ভাই শাহেদ চৌধুরীর বিবৃতিতে : 'জানি না কোথায় যায়, কি করে, কেমন করে দিনরাত কাটে/ চাকুরিতে মন নেই, সর্বদাই রক্তনেত্র, শোকের পতাকা/ মনে হয় ইচ্ছে করে উড়িয়েছে একরাশ চুলের বদলে!' (*উত্তরাধিকার*)। 'মা তাঁর ছেলের প্রতি' কবিতায় শামসুর রাহমান নিজের প্রতিকৃতি আঁকেন মায়ের দৃষ্টিকোণ ব্যবহার করে : 'সন্ধ্যার/ সোনালি-কালো প্রহরে ভাবছি, বাচ্চু,/ কতদিন তোর সঙ্গে আমার দেখা নেই' (*অস্ত্রে আমার বিশ্বাস নেই*)। মা তাঁর ডাক নাম 'বাচ্চু' বলে সম্বোধন করেছেন, মায়ের দৃষ্টিকোণ ব্যবহার করে কবিতাটি নির্মিত, যে দৃষ্টিকোণ সৃষ্টি করেছেন শামসুর রাহমান নিজে, তাঁর স্বকীয় বিশ্বাসের প্রতিনিধি মায়ের বয়ানে শৈশব-কৈশোরের যাপিত জীবনের নানা প্রান্ত উদ্ভাসিত হয় আত্মজৈবনিক এষণায়। শামসুর রাহমানের কবিসত্তা ক্ষত-বিক্ষত হয়েছিল মায়ের মৃত্যুর বেদনায়। *কালের ধুলোয় লেখা*তে কবি বলেছেন : 'মা মারা যান ১৯৯৭ সালের ১৬ ফেব্রুয়ারি। সেই বছরের ৭ মার্চ আমি লিখে উঠতে পারি 'মার কবরের পাশে দাঁড়িয়ে' কবিতাটি – 'কী ক'রে যে তোমাকে শুইয়ে দিতে পেরেছি এখানে/ শীতল মাটির নিচে?' (রাহমান, ২০০৪ : ২৬৩)। মায়ের স্মৃতি এবং মৃত্যু নিয়ে আবেগমথিত অনেক কবিতা তিনি লিখেছিলেন, 'আমার ডান হাত' (*স্বপ্ন ও দুঃস্বপ্নে বেঁচে আছি*), 'তোমার কাছ থেকে' (*নক্ষত্র বাজাতে বাজাতে*) কবিতাগুলো মাতৃস্মৃতি-মথিত। শামসুর রাহমানের জীবনসঙ্গিনী ছিলেন জোহরা বেগম, জীবনের নানা সংকটে একই ছাদের তলায় প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তির সমীকরণ মিলিয়েছেন তারা যুগের পর যুগ। জোহরা প্রসঙ্গে কবিতা :

> একজন জোহরা আমার মশারি টাঙ্গিয়ে
> ভাত নিয়ে মধ্যরাত অব্দি জেগে থাকে, প্রতীক্ষার আলপিন
> ক্রমাগত ফুটতে থাকে ওর সত্তায়।
> ('আমার কবিতা আজ', *শিরোনাম মনে পড়ে না*)

শামসুর রাহমান আড্ডাপ্রিয় কবি ছিলেন, আড্ডা শেষে গভীর রাতে বাসায় ফেরার পরের অভিজ্ঞতা এবং জোহরা বেগমের মনস্তত্ত্ব কবিতাটিতে ধরা পড়েছে। যাপিত জীবনে জোহরা কবির সংকটের সহযাত্রী, ইতিহাসের অনেক কালো পর্ব তিনি অতিক্রম করেছেন জোহরা বেগমের সঙ্গে। একাত্তরের পঁচিশে মার্চের কালরাত বিবৃত করতে গিয়ে শামসুর রাহমান বলেছেন : 'আমার সীমাহীন অবসাদ, নিষ্ক্রিয়তা আর পাথুরে ঘুম আমার শয্যাসঙ্গিনীর মধ্যে সংক্রমিত হয়েছিল। মাঝে মাঝে ভয়ানক শব্দ শুনে চমকে ওঠা ছাড়া অন্য কোনো ভূমিকা ছিল না আমাদের। ঘুমন্ত আমরা টের পাইনি, কী ভয়াবহ এক সকাল অপেক্ষা করছে আমাদের জন্যে' ('কালঘুম', *অস্ত্রে আমার বিশ্বাস নেই*)। কবির পুরোনো ঢাকা যখন জ্বলছিল হানাদারদের তাণ্ডবে সেই আতঙ্কিত সময়ের রেখাচিত্র শামসুর রাহমানের 'তুমি বলেছিলে' কবিতাটি (*বন্দি শিবির থেকে*)। বাইরের আগুন পোড়াচ্ছিল নয়াবাজারকে, ভেতরে দগ্ধ হচ্ছিল বাঙালির মূল্যবোধ, বাঙালি জাতিসত্তা, নয়াবাজারে আগুন দেবার ঘটনার ভয়াবহতা প্রত্যক্ষ করেছিলেন কবি স্বয়ং, পাশে ছিলেন কবিপত্নী।

মা এবং স্ত্রী ছাড়াও পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের স্বনামে সম্বোধন করে কবিতার বিষয় করে তুলেছেন। 'নয়না এবং আমি' (*টুকরো কিছু সংলাপের সাঁকো*) কবিতায় মৃত্যুচেতনা-তাড়িত কবি পার্থিব জীবনের পিছুটান অনুভব করেন, পৌত্রী নয়নাকে কেন্দ্র করে ঘনবদ্ধ হয় তাঁর আবেগ, জীবনাকাঙ্ক্ষা। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে শামসুর রাহমানের চৈতন্যকে গ্রাস করেছে মৃত্যুভীতি, একসময়ের সেই সাহসী কবি শামসুর রাহমান যিনি প্রথম মৃত্যুর দায় স্বেচ্ছায় কাঁধে তুলে শিল্পের জগতে এসেছিলেন দ্বিতীয় জীবনের উত্তরাধিকার নিয়ে, সেই কবি পার্থিব মৃত্যুর চিন্তায় প্রবলভাবে আক্রান্ত হন। তিনি তাঁর জীবনকাতরতা, পার্থিবতাকে, বয়সোচিত কারণে ক্ষয়ে যাওয়া শরীরের নানা অক্ষমতাকে অকপটে উন্মোচন করেন কবিতায়। ফলে, তাঁর কবিতা আত্মজৈবনিকতার সরল পথ ছেড়ে আত্মস্বীকারোক্তির স্বভাবকে আয়ত্ত করে :

আমাকে এখন থেকে আরেকটু বেশি, আরেকটু
ভালো করে দেখে নাও। কতটা বিবর্ণ হয়ে কত
ক্ষয়ে গেছি, চামড়া কুঁচকে গেছে কত, কত চুল হলো লীন দূরের হাওয়ায়,
কেমন স্খলিত দাঁত, আমার নিভৃত
দৃষ্টিশক্তি কত শোচনীয় ক্ষীণ আজ ভালো করে দেখে নাও।
('আমাকে এখন থেকে', *ছায়াগণের সঙ্গে কিছুক্ষণ*)

'আত্মস্বীকারোক্তিমূলক কবিতা নির্মাণের জন্য প্রয়োজন হয় দুঃসাহস, স্পর্ধা : 'আত্মজৈবনিক কবিদের সততা ও সাহসের সবচেয়ে কঠিন পরীক্ষা স্বীকারোক্তিমূলক কবিতায়' (গুপ্ত, ২০১১ : ১৯৯)। কবিজীবনের প্রথমার্ধে তিনি নিষ্কলুষ আত্মজৈবনিকতাকে উপজীব্য করেন, বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে আত্মজৈবনিকতা পর্যবসিত হয় আত্মস্বীকারোক্তিতে। খিষ্টধর্মে যেমন যাজকের পৌরহিত্যে ঈশ্বরের সঙ্গে পুনর্মিলন ঘটে; আত্মস্বীকারোক্তিমূলক কবিতায় পাঠককে পুরোহিত মেনে কবিকে দাঁড়াতে হয় কঠিনতম সত্যের মুখোমুখি, ব্যক্তিগত জীবনের কোনো অন্ধকারময়তার উচ্চারণ হয়ে ওঠে কবিতা, পাঠক কবির অন্তর্জীবনের একান্ত কথনের অনুগামী হতে পারে। কনফেশনাল কবিতা প্রসঙ্গে বলতে গেলে একজন বাঙালি কবির নাম সবার আগে স্মরণের তালিকায় চলে আসে, তিনি কবিতার জন্য নিজের ভাষা, রুচি, সংস্কার, ধর্ম, দেশ সব ত্যাগ করেছিলেন, কবি হিসেবে এটি ছিল তাঁর ভুল, তাঁর শৈল্পিক স্খলন। পরবর্তীকালে বাংলা ভাষায় কবিতা লিখে তিনি এই স্খলনের প্রতিবিধান করেছিলেন। সেইসব কবিতায় আছে অনুশোচনা, আছে স্বীকারোক্তি :

হে বঙ্গ, ভাণ্ডারে তব বিবিধ রতন–
তা সবে, (অবোধ আমি!) অবহেলা করি,
পর-ধন-লোভে মত্ত, করিনু ভ্রমণ
পরদেশে, ভিক্ষাবৃত্তি কুক্ষণে আচরি।
('বঙ্গভাষা', *চতুর্দশপদী কবিতাবলী*)

মাইকেল মধুসূদন দত্ত, বাংলা কবিতার আধুনিক পুরুষ যাঁকে বলা হয়, তিনি উপলব্ধি করেন দেশ ও বাংলা ভাষা ত্যাগ করে পাশ্চাত্য সাহিত্যে প্রতিষ্ঠালাভের লোভ তাঁর গুরুতর অপরাধ ছিল। তাঁর বিখ্যাত সনেটে বিবৃত মোহতাড়িত আসক্ত মনের অনুশোচনাবোধ ও স্বীকারোক্তি পাঠকের সহানুভূতি লাভ করতে সক্ষম হয়েছিল, ফলে পরবর্তীকালে বাংলা

সাহিত্যে তিনি একটি পাকা আসন দখল করেন। কবি ও নাট্যকার হিসেবে স্বদেশ, স্বভাষা ও আপন সংস্কৃতির সঙ্গে এই স্বীকারোক্তির ভেতর দিয়ে তাঁর পুনর্মিলন ঘটে। 'বঙ্গভাষা' কবিতায় 'অবোধ', 'ভিক্ষুক', 'পর-ধন-লোভে মত্ত' ইত্যাদি শব্দগুচ্ছে যে স্বীকারোক্তি দেখা যায় তা কি কনফেশনাল নয়? তাঁর যেসব কবিতায় স্বদেশপ্রীতি প্রকাশ পেয়েছে, সেগুলোর বেশিরভাগ সনেট। অবশ্য *মেঘনাদবধ কাব্যের* স্বদেশপ্রেম প্রতীকী তাৎপর্য পেয়েছে, তবে দেশপ্রেমমূলক সনেটগুলোতে তিনি নিজেকে বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে সরাসরি বিদ্ধ করেছেন। মাইকেলের ব্যক্তিগত জীবনের মানচিত্রের ভেতরে রয়েছে তাঁর উদ্দেশ্যের অন্ধকার, কবিতাকে ব্যবহার করে আত্মপরিচয় বদলে ফেলার বৃথা চেষ্টা। সেই সত্য যখন পাঠককে জানিয়ে দেন অকপটে, তখন একথা বলা যায় যে, তাঁর 'বঙ্গভাষা' কবিতাটি বাংলা স্বীকারোক্তিপ্রবণ কবিতার আদি নমুনা।

আধুনিকতার পরবর্তী পর্যায়ে অর্থাৎ মধুসূদন দত্ত-পরবর্তী বাংলা কবিতাধারা গীতল হয়ে উঠেছে বিহারীলাল চক্রবর্তী ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের হাত ধরে। সেইসব গীতিকবিতায় আনন্দ-বেদনা, প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তি, ক্ষোভ, মানসিক যন্ত্রণা– সবই স্বীকার করা হয়েছে, মানবসত্তার চিরন্তন আবেগের সঙ্গে মিথস্ক্রিয়া ঘটেছে কবির একান্ত অনুভূতির। নিজের একান্ত এই অনুভূতিগুলোর স্বীকারোক্তি অন্যরকম– সারদা দেবীকে যেমন বিহারীলাল বলেছেন : 'তোমা হারা হলে আমি গতিহারা হই'– এখানে কবির অনুভূতি সত্য, কিন্তু সত্যের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে তাকে স্বীকার করে নেবার দায় নেই, কেননা এসব স্বীকারোক্তি কলুষমুক্ত, এই সত্যকে সবার সামনে উন্মুক্ত করতে দ্বিধা নেই। যেমন রবীন্দ্রনাথ তাঁর কাব্যপ্রেরণার উৎসকে শনাক্ত করেছেন জীবনদেবতা নামে, সে এক গোপনতম বিমূর্ত সত্তা, তিনি জীবনদেবতাকে বলেন : 'আর কতদূরে নিয়ে যাবে মোরে হে সুন্দরী...' এই উচ্চারণ বয়ে নিয়ে আসে তাঁর উপলব্ধির সত্যতা; তিনি স্বীকার করে নেন, কেউ একজন যেন তাঁকে দিয়ে লিখিয়ে নেয়। এই স্বীকারোক্তির ভেতরে কোনো গ্লানি নেই, নেতিবাচকতার ইঙ্গিত পর্যন্ত নেই, নেই কোনো দয়িতা-সমাচার। এ এক এমন সাধারণ গোপন সত্য, যা প্রকাশ করলে মনের গ্লানিমুক্ত হওয়া যাবে এমন ব্যাপার নয়, বরং সর্বাঙ্গসুন্দর, পরিমার্জিত অনুভূতির প্রকাশ এটি। পরবর্তীকালে তিরিশি আধুনিকতা কবিতার সুচিন্তিত রাবীন্দ্রিক নান্দনিকতা ছেঁটে দিয়ে, কবিতাকে জীবনের আরও কাছে টেনে আনল। তখন মানুষের ক্ষমাহীন পাপ-পঙ্কিলতা, গোপনতম কামনা-বাসনা সব কবিতার দ্বারস্থ হলো প্রথমবারের মতো। ফ্রয়েডের মনোবিকলন-বিষয়ক তত্ত্ব, বোদলেয়ারের 'ক্লেদজ কুসুম', এলিয়টের 'ওয়েস্ট ল্যান্ড' আরও উস্কে দিল আধুনিক কবিতাকে। দৈনন্দিন জীবনের ক্ষুদ্রতা, তুচ্ছতা, ক্লেদ, গ্লানি, হতাশা সবকিছুকেই স্বীকার করে নিল কবিতা। জয় গোস্বামী 'নিজের জীবন, বীজের জীবনে' বলেছিলেন : 'স্বীকার করব, আমি আত্মজীবনীই লিখতে চেষ্টা করি। এই পৃথিবীতে, পৃথিবীর বাইরেও আমার জীবদ্দশায় যা কিছু ঘটবে, সবই আমার আত্মজীবনী' (চট্টোপাধ্যায়, ২০১১ : ২২৯)। এভাবে তিনি কবির আত্মজৈবনিকতাকে তাঁর ব্যক্তিসত্তার সংকীর্ণতা থেকে মুক্ত করে শিল্পের সীমাহীন প্রান্তরে বুনে দেন। ফলে ব্যাপারটি এমন দাঁড়াল যে, আধুনিক কবিতা মানেই এক ধরনের স্বীকারোক্তি, আত্মজৈবনিকতা। কবির সত্তায় মিশে যায় বহু মানুষের জীবন-বাসনা, তাঁর চেতনার তারে বাজে অগণিত মানুষের আনন্দ-বেদনার বিচিত্র সুর। কবির আত্মজৈবনিকতাকে শনাক্ত করা সহজ নয়, এজন্য শামসুর রাহমান স্বীকার করেছিলেন, 'সবচেয়ে আশ্চর্য তুমি হে আমার আপন প্রতিমা' ('আশ্চর্য', *মাতাল ঋত্বিক*)। কবি

আত্মময়তায় বিবশ হয়ে ব্যক্তিগত ভাবনার রূপায়ণ ঘটাতে গিয়ে উপলব্ধি করেন, 'আমি' বলে কোনো একক বা বিশুদ্ধ সত্তার প্রতিরূপ সৃষ্টি কবির কলমে সুকঠিন :

যখনি টেবিলে ঝুঁকে আত্মকথনের
মদে বুঁদ হই, দেখি, আমার নিজের মুখ দ্রুত
কেমন বদলে যায়, আমার মুখের ভাঁজে ভাঁজে
বসে যায় সুগভীর অজস্র মুখের রেখাবলী।
('আত্মজীবনী বিষয়ক', *ফিরিয়ে নাও ঘাতক কাঁটা*)

এ কারণেই কবির আত্মজীবনীতে কবিকে খুঁজে পাওয়া যায় না, *কালের ধুলোয় লেখা* আত্মজীবনীগ্রন্থ নিয়েও অনেকের এ ধরনের অভিযোগ ছিল। কবির সত্তায় পরজীবিতা গ্রহণ করে পুরাণ, স্বদেশ, সমকাল, বিশ্ব; কাল থেকে কালান্তরে, ভূগোলের সীমাচিহ্ন ছাড়িয়ে কবির মানসলোক, চেতনার বিস্তার। এ কারণে 'আমি' বা 'আমার' শব্দ-বন্ধনীর ভেতরে আবদ্ধ বাণী বেশিরভাগ সময় সর্বজনীন রূপ নিয়ে বিকশিত হয়। আত্মপরিক্রমাপ্রিয় কবির যে প্রতিকৃতি নির্মিত হয় কবিতায়, কবির প্রতিকৃতি হিসেবে তাকে চেনা যায় না, আবার সে প্রতিকৃতি এই পরিচিত প্রতিবেশের বাইরের কোনো ভিনগ্রহ থেকে সংগৃহীত নয় বলে অচেনাও থাকে না, চেতনার এমনই এক দ্বৈরথে প্রতিনিয়ত কবি বাঁধা পড়েন, কবিতাকে বাঁধেন; স্থান, কাল, পাত্রের মিথস্ক্রিয়ায় তৈরি কবির ব্যক্তিসত্তা এমনকি শরীরী কাঠামোও দখলীকৃত ভূমির মতো পরাধীন :

এই যে দেখুন,
আমার দু'চোখে দগ্ধ গ্রাম বেশুমার,
আমার ললাটে
আহত শহরগুলো ব্যান্ডেজসমেত
শুয়ে আছে।
... ...
আমার চিবুকে কতো ভগ্ন সেতু বারুদের গন্ধে
ভরপুর কতো যে পরিখা,
আমার চোয়ালে লগ্ন লক্ষ্মীবাজারের
সুহাসিনী দেবীর রক্তিম শাড়ি, যেন স্বাধীনতার পতাকা।
('আমি তো মেলারই লোক', *ফিরিয়ে নাও ঘাতক কাঁটা*)

কবি কি সবসময় 'মেলারই লোক', তাঁর একান্ত-লোক বলে কি কিছু নেই? সমষ্টিসত্তা থেকে কবিকে বিচ্ছিন্ন করে যা কিছু একান্ত এবং নিজস্ব, যা কিছু অবচেতনে-অবদমনে-বিকারের ঘোরে মনের গহিনতম প্রদেশে লুকিয়ে থাকে, তাকেই কবিতার খাতায় তুলে আনার সুযোগ করে দিলেন আত্মস্বীকারোক্তিপ্রবণ কবিরা। গোষ্ঠীবদ্ধ জীবনের দায় স্বীকার করে কবির ভেতরেও ব্যক্তিস্বরূপের উপলব্ধি ঘটতে পারে : 'গোষ্ঠীভুক্ত প্রাণী আমি, তবু/ হঠাৎ ব্যক্তিস্বরূপ জাগে;' (*'মধ্যবিত্তের পাঁচালি', উদ্ভট উটের পিঠে চলেছে স্বদেশ*)। তখন আত্মজৈবনিক

অনুভাবনা-তাড়িত কবির সমষ্টিসত্তা ও শ্রেণিচরিত্র থেকে বিযুক্ত করে নিজেকে একাকী নিরীক্ষণের অবকাশ ঘটে :

শামসুর রাহমান বলে আছে একজন, যার
প্রতি ইদানীং
বিমুখ নারীর ওষ্ঠ, শিল্পকলা, বাগানের ফুল।
('পারিপার্শ্বিকের আড়ালে', *শূন্যতায় তুমি শোকসভা*)

ব্যক্তিসত্তার ভেতর থেকে কবিসত্তার অস্তিত্বকে বিচ্ছিন্ন করে ছুঁড়ে দেন কবিতার তীব্র আলোয়, দক্ষ শল্যবিদের মতো নিজেকে স্বনামে সম্বোধন করে চালাতে থাকেন অস্ত্রোপচার প্রক্রিয়া, 'শামসুর রাহমান' তাঁর কবিতার নিরীক্ষালয়ে পড়ে থাকেন অসহায় অনুজীবের মতো। সময়ের সাথে সাথে নিজেকে উন্মোচনের স্পর্ধা শামসুর রাহমানের আরও বেড়েছে, তাঁর আত্মজৈবনিক কবিতাধারার ভেতরে ক্রমশ বিকশিত হয়েছে স্বীকারোক্তির ব্যাকুলতা। স্বীকারোক্তির দায় থেকেই তিনি তাঁর অস্তিত্বের অংশ কবিতাকে নির্দ্বিধায় দাঁড় করিয়ে দেন আত্মস্বীকারোক্তির কাঠগড়ায় :

কেন তুমি মুখ নিচু করে থাকো সারাক্ষণ? কেন
লোকলোচনের অন্তরালে থাকতে চাও?
তোমার কিসের লজ্জা? কোন্ পাপবোধে আজকাল
তোমাকে অমন দীন ছায়াচ্ছন্ন করে রাখে?
... ...
না, তুমি লজ্জায় মুখ আঁধার-নিবাসে
রেখো না লুকিয়ে আর থেকো না অমন
নতজানু হয়ে,
যেমন ভয়ার্ত পাপী ধর্মযাজকের প্রকোষ্ঠের
সম্মুখে একাকী হাঁটু গেড়ে বসে কাঁপায় অধর।
('কেন তুমি', *ফিরিয়ে নাও ঘাতক কাঁটা*)

'কনফেশন' প্রক্রিয়া সম্পর্কে যথেষ্ট ধারণা রাখতেন শামসুর রাহমান, এ কারণে কবিতার কনফেশনপ্রবণ চারিত্র্যকে তিনি সহজেই চিহ্নিত করতে পারেন। কবিতার অবয়বে এই অপরাধবোধ, অনুশোচনার ছায়া কেন? এর সঙ্গে স্বদেশ, সমকাল, ইতিহাস এবং শামসুর রাহমানের কবিজীবনের গভীর সম্পৃক্তি খুঁজে পাওয়া যায়। একাত্তরে শামসুর রাহমান অস্ত্রের পরিবর্তে হাতে নিয়েছিলেন কলম, তাঁর জীবদ্দশার ক্রান্তিকালে তিনি বারবার কবিতার ভাষাতেই তৈরি করেছেন প্রতিবাদ, প্রতিরোধ। দুঃশাসনের কেন্দ্রে বসে দুঃসময়কে রূপদানের জন্য যে দুঃসাহস প্রয়োজন হয়, শামসুর রাহমানের কবিসত্তায় সেই স্পর্ধা ছিল। এ কারণে একাত্তরের রক্তাক্ত গর্ভে বসে তিনি যেসব কবিতার জন্ম দিয়েছিলেন সেগুলো ছিল অস্ত্রের মতোই ভয়ংকর, কবির জীবন ছিল যোদ্ধা জীবনের মতোই অনিকেত, বিপদসংকুল, মৃত্যুর ইশারাময়। সে-সময় কবিতার ডায়েরিকে বাঁচানোর জন্য তিনি জীবন বিপন্ন করেছেন, বিনিময়ে কবিতার কাছে কিছু প্রাপ্তির প্রত্যাশা কবির ছিল, কিন্তু কবিতা দিয়ে স্বাধীনতাকে ফলপ্রসূ করে তোলা যায় না, রুদ্ধ করে দেয়া যায় না মানবতা-বিধ্বংসী বিশৃঙ্খলা ও নৈরাজ্যের

নিরন্তর প্রবাহ। নিষ্ক্রিয়, নির্বাক কবিতাকে তাই কবি কাঠগড়ায় দাঁড় করান, যেমন প্রতিনিয়ত নিজের কবিসত্তাকেও চুলচেরা বিশ্লেষণ করে গেছেন কবিতার উন্মুক্ত প্রান্তরে, নিজের সৃজনক্ষমতা, সৃষ্ট কবিতার ওপর প্রয়োগ করেছেন সমালোচনার ধারালো অস্ত্র। নিজের অস্তিত্বকে এক অদ্ভুত নির্দয় পরিহাসের পাত্র করে তোলেন কবিতায় :

আমি, শামসুর রাহমান, অবশেষে
কাফকার গ্রেগর শামসা হয়ে যাব? আমি বড়
বেশি ছোট হয়ে যাচ্ছি, মনে হয়; কীট পতঙ্গের
মতোই আমি কি তবে দেয়ালে বসবো? মৃত্তিকায়
খাবো লুটোপুটি কিংবা নোংরা শুঁড়ে নিয়ে নিরুদ্বেগ
নর্দমার ধারে উড়ে যাবো আবর্জনা ভালোবেসে?

('চেয়ার অস্বস্তিকর', *আদিগন্ত নগ্ন পদধ্বনি*)

'গ্রেগর শামসা' চরিত্রটি কাফকার সৃষ্টি, *দি মেটামরফসিস* উপন্যাসে গ্রেগর শামসা হঠাৎ একদিন বিকট ঘুণপোকায় রূপান্তরিত হয়ে যায়, নতুন এক জীবসত্তার সঙ্গে অভিযোজনের লড়াই শুরু হয় তার। কবি মূলত এক রূপান্তরশীল সত্তা, প্রতিনিয়ত রূপান্তরের ভেতর দিয়ে কবি প্রবেশ করেন নতুন নতুন জীবনাভিজ্ঞতায়, সজীব করেন চৈতন্যকে। কবিতার জন্য কবির এই নিরন্তর রূপান্তর-প্রক্রিয়া : 'তোমার জন্যে টুকরো টুকরো সত্তাটাকে নিংড়ে নিয়ে/ রূপান্তরের গভীরে যাই, ...তোমার জন্যে যখন তখন নিজেকে খুব বদলে ফেলি, আমূল আমি/ বদলে ফেলি' ('বদলে ফেলি', *আদিগন্ত নগ্ন পদধ্বনি*)। নিজের মধ্যে বহুকে ধারণ, বহুর মধ্যে নিজেকে বণ্টন, এভাবেই রূপান্তর-সমাচার দিয়ে ঘেরা কবির অন্তর্জগৎ। এ কারণে কবিকে দুঃখ দিতে বারণ করেন কবি, কারণ কবির দায় অনেক, কবি হলেন সেই ব্যক্তি যার একান্ত নিজস্ব বলে কিছু অবশিষ্ট থাকে না : 'নিজস্ব জীবন রেখেছে সে/ গচ্ছিত সবার কাছে নানান ধরনে অকপট' ('কবিকে দিও না দুঃখ', *আমি অনাহারী*)। শামসুর রাহমান তাঁর 'গচ্ছিত' কবিসত্তাকে সর্বসমক্ষে প্রতিনিয়ত যাচাই করেছেন এবং ব্যর্থতার দায় থেকে নিজেকে অব্যাহতি দেননি। কবিসত্তার মতো নিজের ব্যক্তিসত্তাকেও অনেক সময় দাঁড় করিয়েছেন কনফেশনের সুকঠিন ভূমিতে। নিজের ব্যক্তিগত জীবনের ওপর থেকে গোপন আবরণ উন্মোচনের প্রয়াস শামসুর রাহমানের কবিতায় অপ্রতুল নয়; যদিও তাঁর কবিতা আত্মস্বীকারোক্তিমূলক— কবি সিলভিয়া প্লাথ বা রবার্ট লাওয়েলের কবিতার মতো সর্বাঙ্গে আত্মস্বীকারৌক্তিক নয়। 'বাক্স উপাখ্যান' কবিতায় জোহরা বেগমের সঙ্গে যাপিত দাম্পত্যের ভেতরে হঠাৎ এক গভীর অসুখের রাতে মনে আলোড়ন সৃষ্টি করে দয়িতা :

... এবং জোহরা নাম্নী মহিলার
সঙ্গে থাকি; প্রণয় মরণশীল জেনেও সুদূর সুচেতার সঙ্গে বেশ
ভালোবাসাবাসি হয় প্রধানত কল্পনায়।

('বাক্স উপাখ্যান', *নায়কের ছায়া*)

কবি এই দয়িতাকে স্বনামে সম্বোধন করা থেকে বিরত থাকেন, 'সুদূর সুচেতা' বলার পর আরও সতর্কতার সাথে জানান দাম্পত্য-বহির্ভূত এ প্রণয় মূলত কাল্পনিক, 'প্রধানত কল্পনায়' শব্দদ্বয়ের

চাতুর্যে এখানে সৃষ্টি হয় স্বীকারোক্তির দ্বিধা; কবিতার বাকি অংশ আত্মজৈবনিক বৈশিষ্ট্য নিয়ে উজ্জ্বল।কবিতায় সুস্পষ্ট স্বীকারোক্তির অভাব কবিতায় দুটো কারণে ঘটতে পারে : কবির মনোজাগতিক রহস্য এবং কবিতার শিল্পসৌন্দর্য অটুট রাখা অথবা স্বীকারোক্তির দায় বহনের দুঃসাহসের অভাব। দয়িতা-সমাচারে কপট হলেও নিজেকে উন্মোচনে শামসুর রাহমান প্রায়শই নিঃশঙ্ক :

ক. বাষট্টির এই ছন্নছাড়া ধূলিঝড়ে
কোথায় খুঁজব ডেরা? নিজের শরীর থেকে মুঠো
মুঠো ছাই উড়িয়ে, ফুরিয়ে আয়ুর রেণু
টলতে টলতে আজ এই তো আমার পথ চলা।'
('ছন্নছাড়া ধূলিঝড়ে', *আকাশ আসবে নেমে*)

খ. কখনও বা মনে হয়
বেকুব দাঁড়িয়ে আছি বেখাপ্পা মিনারে, সঙ্গীহীন।
কালের মাজাকি, প্রীতি, খুনসুটি, হিংস্রতা ইত্যাদি
সয়ে সয়ে কেমন গণ্ডার হয়ে গেছি।
('আত্মজীবনী বিষয়ক', *ফিরিয়ে নাও ঘাতক কাঁটা*)

গ. ...আজ আমি বড় একা,
বন্ধুরা যে-যার মতো পথে পর্যটক, কোনোখানে
জমে না তেমন আড্ডা। মেয়েরা স্বামীর ঘর করে,
ছেলেটা এড়িয়ে চলে সকল সময়।
('আত্মচরিত', *এক ফোঁটা কেমন অনল*)

ঘ. বস্তুত আমার জীবন ভুলে কণ্টকিত বলেই নিয়ত
জোড়হাতে ক্ষমাপ্রার্থী অনেকের কাছে
('আমার কেন যে শুধু', *নক্ষত্র বাজাতে বাজাতে*)

পঞ্চাশ পেরোনোর পর থেকেই শামসুর রাহমান শরীরী বিকারের প্রসঙ্গ ক্রমাগত তুলে এনেছেন কবিতায়, তাঁর মৃত্যুভীতিতে আক্রান্ত মনের ভেতর বাসা বেঁধেছে মানসিক বিকার। মন ও শরীর থেকে তারুণ্য ও চাঞ্চল্য ক্রমাগত বিদায় নিয়েছে, কবি প্রতিনিয়ত প্রবেশ করেছেন নিঃসঙ্গতার একান্ত ভুবনে, তাই এক সময়ের গভীর রাতের ঢাকাকে শাসন করে বেড়ানো, আড্ডাবাজ কবিকেও বলতে হয় বন্ধু ও পরিবার-পরিজন থেকে দূরের এক নৈঃসঙ্গমথিত জীবনের কথা। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে প্রাক্তন অপরাধের স্বীকারোক্তিও জরুরি হয়ে ওঠে, কবি 'জোড়হাতে ক্ষমাপ্রার্থী' হন অনেকের কাছে। 'অপ্রেমের কবিতা'তেও শামসুর রাহমানের অনুশোচনাদগ্ধ সত্তার উন্মোচন ঘটেছে : 'আমার বেহুদা/ বেশরম কলম, অতিরঞ্জনে বেজায় দড়, তোমাকে/ পর্বে পর্বে বিব্রত করেছে' (*হৃদয়ে আমার পৃথিবীর আলো*)। দয়িতাকে ছদ্ম আবরণে রেখে প্রেমের কবিতা লিখেও কবি-দয়িতা লোকসমাজের কটাক্ষের শিকার হয়েছেন। ফলে 'অপ্রেমের কবিতা' লিখে কবিকে স্বীকারোক্তি দিতে হয়,

নানা পর্বে তাঁর কবিতায় উচ্চারিত দয়িতা-সংক্রান্ত 'একটি মুক্তোও সাচ্চা নয়'– উচ্চারণের ভেতর দিয়ে দয়িতাকে কেন্দ্রে রেখে কনফেশনের প্রান্তরে নতমুখী হয়েছেন। *রূপের প্রবালে দগ্ধ সন্ধ্যারাতে* কাব্যের 'দুঃস্বপ্নের ঘোর থেকে জেগে' কবিতায় কবির প্রেমিকসত্তা অনাকাঙ্ক্ষিত ভুলের প্রায়শ্চিত্তের জন্য উন্মুখ : 'হয়েছি বিদ্ধ ক্ষমাহীন অপরাধে... প্রেমের অতনু দেবতাকে বলি শোনো,/ শপথ তোমার শুদ্ধ হতেই চাই।' এ কাব্যের 'হন্তারক' কবিতায় দেখা যায় একই ভাবের সম্প্রসারণ, দয়িতাকে যন্ত্রণাবিদ্ধ করার অপরাধে কবি নতজানু : 'আমি/ আজ কাঠগড়ায় দাঁড়াই অসঙ্কোচে অবেলায়।'

'আমি' নামক ব্যক্তিসত্তার আবরণহীন সত্য স্বীকার করে নিয়ে পথচলাই হচ্ছে আত্মস্বীকারোক্তিমূলক কবিতার মূলমন্ত্র। এই সত্য স্বীকারে অবশ্য ঝুঁকি রয়েছে পাঠক-সমর্থন হারানোর। একজন কবি তাঁর কবিতার ভেতর দিয়ে পাঠকের কাছে নিজস্ব ভাবমূর্তি তুলে ধরেন, কবির ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে পাঠকের যে অস্পষ্ট ধারণা থাকে তা বেশিরভাগ সময়েই হয় উচ্চমার্গের। সেক্ষেত্রে একজন কবি যদি তাঁর ভেতরের ভীরুতাকে স্পষ্ট করে তোলেন, কবির নায়কোচিত যে ছায়াচিত্র পাঠকের মানসলোকে গড়ে ওঠে সেই ছবিটি ভেঙে যেতে পারে। শামসুর রাহমান নির্ভয়ে ক্রমাগত আত্মোন্মোচন-প্রক্রিয়া অব্যাহত রেখেছেন,কবিতা ও যাপিত জীবনের মাঝখানে নেই কোনো দেয়াল। তাই শামসুর রাহমানকে আত্মস্বীকারোক্তির আরও গভীরে প্রবেশ করতে দেখি, নিজেকে তাঁর ডাকনাম 'বাচ্চু' বলে সম্বোধন করে 'দুঃসময়ের মুখোমুখি' কবিতাটি শুরু করেন, তারপর সেই 'বাচ্চু'র 'শামসুর রাহমানে' রূপান্তর পর্যন্ত বিবৃত করেন আক্রুহীন :

এখন আমিও খুব সহজে ঠকাতে পারি, বন্ধুর নিন্দায়
জোর মেতে উঠতে লাগে না দু-মিনিটও; কখনোবা
আত্মীয়ের মৃত্যুকামনায় কাটে বেলা, পরস্ত্রীর
স্তনে মুখ রাখার সময় বেমালুম ভুলে থাকি
গৃহিণীকে।

('দুঃসময়ের মুখোমুখি', *দুঃসময়ের মুখোমুখি*)

'বাচ্চু' নামে নির্মল শৈশব কাটানো এগারো বছর বয়সের বালকের মুখোমুখি তিনি, দাঁড়ানো নয়। অনেকটাই নতজানু হয়ে তিনি উচ্চারণ করেছেন আত্মস্বীকারোক্তিমূলক পঙ্‌ক্তিমালা। বাচ্চুর পরিণত রূপ 'শামসুর রাহমান', এখানে 'শামসুর রাহমান' শুধু নামবাচক শব্দ নয়, এই নামটির ভেতরে তিনি আত্মপরিচয় উন্মোচনে প্রয়াসী : 'আমি শামসুর রাহমান, সাংবাদিক, ক্ষিপ্র ভাষ্যকার;/ আমি শামসুর রাহমান, মানে কবি...' ('দুঃসময়ের মুখোমুখি', *দুঃসময়ের মুখোমুখি*)। শামসুর রাহমানের আত্মজৈবনিক কবিতায় স্বনামে নিজেকে সম্বোধনের প্রবণতা রয়েছে। তবে সম্বোধনধর্মী সব কবিতাই কনফেশনাল নয়, যেমন আত্মজৈবনিকতা মানেও কনফেশনালিজম নয়। 'আমার পূর্বপুরুষগণ' কবিতায় তিনি যখন বলেন :

আমার বাবাকে দেখেছি
মাথা উঁচু করে পথে দীঘল ছায়া ফেলে যখন
হেঁটে যেতেন,
... ...

এখন তিনি ঘুমিয়ে আছেন পাড়াতলী গ্রামে
('আমার পূর্বপুরুষগণ', *শুনি হৃদয়ের ধ্বনি*)

'আমার পূর্বপুরুষগণ' শিরোনাম যুক্ত করে কবিতায় বংশপরম্পরার যে রেখাচিত্র কবি আঁকেন, সেটি নিঃসন্দেহে আত্মজৈবনিক। অন্যদিকে নিজেকে নির্দেশ করে বলেন :

উত্তরচল্লিশ আমি; পাঁচ ফুট পাঁচ ইঞ্চি কিংবা
তারও কম উচ্চতা আমার। চুলের শ্বেত পতাকার
কী বাহার ইদানীং, নানান ব্যাধির গলাগলি
এ শরীরে এবং আয়ুর ভেলা নিত্য কম্পমান।
('স্বীকারোক্তি', *এক ধরনের অহংকার*)

এই 'স্বীকারোক্তি'র ভেতরে কেবল আত্মজৈবনিকতা নয়, রয়েছে স্বীকারোক্তি-প্রবণতা, বয়সের আঘাতে বিপর্যস্ত শরীরী-কাঠামোর উন্মোচন। বার্ধক্য অনেক সময় কবির মানসলোকে হানা দিয়েছে ব্যাধির মতো, ব্যাধের মতো : 'আজকাল বড় বেশি ভয়ে ভয়ে থাকি দিনরাত।/ বয়স বেড়েছে বলে এই ভয় আমাকে কেবলি/ তাড়িয়ে বেড়ায় না কি কুকুরের মতো?' ('ভয়ে ভয়ে থাকি', *এসো কোকিল এসো স্বর্ণচাঁপা*)। তবে এইসব স্বীকারোক্তি কবির চূড়ান্ত পর্যায়ের স্বীকারোক্তি নয়, নিজের প্রতিকৃতি অঙ্কন করতে গিয়ে যে স্তরে পৌঁছান কবি, সেখানে নিষ্কলুষ আত্মজৈবনিকতার পরিবর্তে আত্মধিক্কৃত এক কবির স্বীকারোক্তি ধ্বনিত হয় :

নিজেই অবাক মানি আজকাল, কী নির্লজ্জ আমি।
জনসমক্ষেই তুলি আমার মনের চিটচিটে
খুশ্‌কি ইতস্তত আর ব্যক্তিগত রাখি না কিছুই–
দিয়েছি প্রকাশ্যে মেলে অন্তর্গত সব ডালপালা।
('স্বীকারোক্তি', *এক ধরনের অহংকার*)

কবি হিসেবে 'খ্যাতি' ও 'মুদ্রা' লাভের আকাঙ্ক্ষায় শুধু নিজের জীবন নয়, সাধারণের জন্য কবিতায় উন্মুক্ত করেছেন 'প্রিয়ার চোখ, চুল, বুক' ইত্যাদি।

শামসুর রাহমানের কবিতার কনফেশন প্রবণতার স্বরূপ উদ্ধারের ক্ষেত্রে অবশ্য সতর্ক থাকতে হয়, কারণ নিজেকে উন্মোচন করতে গিয়েও কবিতার শৈল্পিক প্রহেলিকার অন্তরালে এক রহস্যঘনতাও তিনি তৈরি করেন কোনো কোনো কবিতায়। তাই প্রশ্ন জাগে, তাঁর কবিতার সব 'আমি'-ই কি আত্মজৈবনিক অথবা আত্মস্বীকারৌক্তিক 'আমি'? এ ক্ষেত্রে কবিতায় সর্বনামের ছলনা বিষয়ে বিশেষভাবে সতর্ক থাকতে হয়। স্বীকারোক্তিমূলক কবিতায় 'আমি'র ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়, কিন্তু প্রথম পুরুষে বর্ণিত সব কবিতাই কি সেই 'আমি'র স্বীকারোক্তি? নাকি সেই 'আমি'র মধ্যেও কথা বলে উঠতে পারে অন্য কোনো জন। অনেকের মধ্যে নিজেকে প্রোথিত করার অথবা নিজের মধ্যে অন্যকে রোপণ করার শৈল্পিক এই গুণ প্রসঙ্গে শহীদ কাদরী বলেছেন :

> ব্যক্তিগত জীবন অবশ্যই লেখায় ছায়া ফেলে। কখনো কখনো ছদ্মবেশী অবস্থায় থাকে, কখনো কখনো সরাসরি প্রভাব ফেলে। তবে একজন লেখক যখন প্রথম পুরুষে কথা বলেন – 'আমি

> আমি' করে, তার মানে এই না উনি নিজের কথাই বলছেন।...নিজস্ব ব্যক্তিসত্তার ছাপ থাকা সত্ত্বেও কখনো কখনো তাঁর পক্ষে সম্ভব হয় – কীটস যে ক্ষমতাকে বলেছেন নেগেটিভ ক্যাপাবিলিটি, তাঁর পক্ষে সম্ভব হয় অন্য কণ্ঠস্বরে কথা বলার। যেমন, একটা মেয়ের দৃষ্টিকোণ থেকে পৃথিবীকে দেখার। রবীন্দ্রনাথের 'বেলা হলো মরি লাজে' – এটা কিন্তু রবীন্দ্রনাথ না।' (দত্ত, ২০১৬ : ১০৭)

শামসুর রাহমানের ব্যক্তিসত্তা সবসময় 'আমি' সর্বনামকে কেন্দ্র করে বিকশিত হয়নি, সর্বনামের সবগুলো রূপের ভেতরে তাঁর ব্যক্তিসত্তার বিস্তার। সর্বনামের জটিল খেলার উদাহরণ ছড়িয়ে আছে তাঁর অনেক কবিতায়, 'এই এক সময়' (*টেবিলে আপেলগুলো হেসে ওঠে*) কবিতার 'যারা' এবং 'তারা' দুই প্রতিপক্ষ, এই দুদলের মধ্যে তিনি নিজেকে 'তারা'র গোষ্ঠীভুক্ত করেন; এই 'তারা'র সমষ্টি-চেতনার অন্তরালে প্রবহমান এক প্রবল 'আমি'র অস্তিত্ব। কবির অন্তর্জীবন বিচিত্র অনুভব-অভিজ্ঞতায় আলোড়িত, বিচারের সাধারণ মানদণ্ড প্রয়োগ করে কবির অন্তর্লোক আবিষ্কার করা সুকঠিন। এজন্য কবি অনেক সময় বিক্ষুব্ধ চেতনা নিয়ে বলেন : 'এই আপাদমস্তক বাণিজ্যিক উটকো সমাজে,/ বেঢপ সাংস্কৃতিক চণ্ডীমণ্ডপে/ আমাকে বোঝে না কেউ' ('আত্মা ছুঁড়ে দিই', *বুক তার বাংলাদেশের হৃদয়*)। কবি নিজেও কি নিজের আত্মস্বরূপের সঠিক সন্ধান রাখেন? পুঁজিবাদী সমাজ, অস্থিতিশীল রাষ্ট্রীয় কাঠামো, মানবতার বিপর্যয়– কবির মানসভূমিকেও সংশয়ে দোদুল্যমান করে তোলে, দ্বান্দ্বিক সময়ের নিষ্পেষণে দ্বিধান্বিত কবিচিত্ত আত্মস্বরূপ খুঁজতে গিয়ে বিভ্রান্তিতে ভোগেন, 'প্রকৃত কে আমি' কবিতার জিজ্ঞাসার ভেতরে আত্মানুসন্ধানে ব্যাপৃত হন কবি। অনেক সময় সচেতনভাবে নিজেকে সর্বনামের আড়ালে লুকিয়ে রাখেন শৈল্পিক চাতুর্যে : 'এই যে দেখছো যাকে সে নেহাত স্তিমিত পুরুষ' ('অপদার্থের গান', *অবিরল জলভ্রমি*)। এখানে ব্যবহৃত 'যাকে', 'সে' এবং 'স্তিমিত পুরুষ' তিনটি শব্দই কবির আত্মপ্রতিকৃতি নির্দেশ করছে। অথবা মায়ের সেই কণ্ঠস্বর, জিজ্ঞাসা : 'বাচ্চু, তুই এত রাত জেগে লিখছিস?' – এখানে 'বাচ্চু' এবং 'তুই' শব্দের উৎস-বিন্দু শামসুর রাহমান নিজে। নিজেকে বিচিত্রভাবে কবিতায় তিনি নির্মাণ করেছেন, আত্ম-নির্দেশক সর্বনামের প্রচুর ব্যবহারের দৃষ্টান্ত রয়েছে তাঁর কবিতায় : '– বাঙলা ভাষার সর্বনাম-ঐশ্বর্য তিনি নিঃশেষে ব্যবহার করেছেন নিজেকে নির্দেশের জন্যে : শুধু 'আমি' নয়, 'আপনি', 'তুমি', 'তুই', 'তিনি', 'সে' সবই তাঁর চাপে প্রথম পুরুষের সর্বনাম হ'য়ে উঠেছে' (আজাদ, ১৯৮৩ : ২৩)।

মূলত বিংশ শতাব্দীর প্রথম দু'দশকে আধুনিক কবিতার যে চারিত্র্য অর্থাৎ ব্যক্তিসত্তাকে অস্বীকার করে কবিতাকে নৈর্ব্যক্তিক করে তোলার যে প্রচেষ্টা তারই বিপরীতে স্বীকারোক্তিমূলক কবিতার জন্ম, যেখানে কবিই কবিতার বিষয়ী। জীবনের নিষিদ্ধ দিক – যেমন মানসিক বিকার বা দৈহিক উপযুক্ততার অভাব, মাদকাসক্তি, যৌনতা, ভয়ঙ্কর ব্যক্তিগত কোনো অভিজ্ঞতা ইত্যাদি এ ধরনের কবিতার বিষয়ের আসন দখল করে। এখানে কবি নিজেকে মুখোশবিহীনভাবে চিহ্নিত করেন। অবশ্য শৈল্পিক নৈপুণ্য রক্ষা করাটা এই কবিতা কলা- কৌশলের একটি বড়ো অংশ। জীবনের ফাঁক ও ফাঁকিগুলোর রূপান্তর ঘটে কনফেশনাল কবিতায়। ধর্মীয় পরিভাষা থেকে এ কাব্যপ্রকরণটির নামকরণ হয়েছে বলে খ্রিষ্টধর্মের 'কনফেশন'-প্রক্রিয়ার সঙ্গে এর একটা যোগসূত্র অবশ্যম্ভাবী। কনফেশনাল কবিতায় ব্যক্তিগত জীবনস্নাত যে সত্য প্রকাশ পায়, সেইসব সত্য উচ্চারণের দুঃসাহস পূর্বের কবিতাধারায় কমই দেখা যায়। সত্য, সুন্দর, কল্যাণের সমন্বয় ভেঙে দিয়েছিল তিরিশি

আধুনিকতা, এ পর্বের আধুনিক কবিরা জীবনের অন্ধকার ছেঁকে যে সত্যকে তুলে ধরেছিলেন সেটি তাঁদের নিজের জীবনজাত নয়, যদি হয়েও থাকে তাহলে নিজের বিকারগ্রস্ততার বয়ান এসেছে অন্য চরিত্রের মুখোশ পড়ে। ব্যক্তিসত্তাকে অস্বীকার করার সেই প্রবণতাকে অতিক্রমের স্পর্ধা নিয়ে কনফেশনাল কবিরা মুখোশবিহীন মুখোমুখি হলেন পাঠকের। বাংলাদেশের কবিতার আত্মজৈবনিক ধারাটি শামসুর রাহমানের হাতে সমৃদ্ধ হয়েছে নিঃসন্দেহে, কিন্তু তাঁর আত্মস্বীকারোক্তিমূলক কবিতা স্বীকারোক্তির প্রশ্নে বিতর্কিত। 'আপনি', 'আমি', 'তুই', 'তুমি', 'সে'– সর্বনামের সর্বগ্রাসী ব্যবহার; নিজের জন্ম ও বংশ-পরিচয়,পারিবারিক-দাম্পত্য জীবন, দয়িতা সমাচার, তাঁর ব্যক্তিগত জীবন ও কবিতা ইত্যাদি নানা বিষয়ের বহুল বিবৃতি সত্ত্বেও 'তাঁর গোপন জীবন দরোজা খোলেনি' (আজাদ, ১৯৮৩ : ২৩)। বলে তিনি অভিযুক্ত। তারপরওশামসুর রাহমান তাঁর যেসব কবিতায় অন্তর্জাগতিক ক্ষত, কবিজীবন ও কবিতার ব্যর্থতার দায়, বার্ধক্যজনিত শরীরী ক্ষয় এবং মানসিক বিকারেরআত্মনিষ্ঠ বিবৃতি প্রদান করেন, সেসব কবিতা পেয়েছে আত্মস্বীকারৌক্তিক চারিত্র্য। পঞ্চাশের দশকে আত্মজৈবনিক ও আত্মস্বীকারোক্তিমূলক কবিতাধারার উন্মেষ ও বিকাশকালের কবি হিসেবে শামসুর রাহমান গুরুত্বপূর্ণ।

টীকা

১. আত্মস্বীকারোক্তিমূলক কবিগোষ্ঠীর সঙ্গে সংযুক্ত ছিলেন– রবার্ট লয়েল, সিলভিয়া প্লাথ, এ্যানি সেকসটোন প্রমুখ।

২. সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, "স্বীকারোক্তি, স্মৃতি, স্বপ্ন", *কবিতার জন্ম এবং অন্যান্য*, পৃ ৪৯-৫০, (উদ্ধৃত, মাসুদুজ্জামান, ১৯৯৩ : ১৩৪)

৩. 'বাবুর বাজারে কয়েকটি ছবির দোকান ছিল।...একটি দোকানে দেখেছিলাম দুলদুলের ছবি। কাচের আড়ালে তীরবিদ্ধ রঙিন দুলদুল।...তখন স্কুলে যাওয়ার পথে কতদিন সেই ছবির দিকে তাকিয়ে থেকেছি ঘণ্টার পর ঘণ্টা।' (রাহমান, ২০০৪ : ২৩)

৪. 'নিজের বেকারত্বের জন্যে এক ধরনের বেদনাবোধ এবং হতাশা আমাকে খুব কাতর করে তুলেছিল সত্য। আমার এই মনোভাব কোনও বন্ধু, এমন কি জীবন সঙ্গিনীর কাছেও প্রকাশ করিনি।' (রাহমান, ২০০৪ : ১৩৬)

৫. প্রসঙ্গক্রমে শহীদ কাদরী উল্লেখ করেছেন : 'তারা বেশ ধনীই ছিলেন।' কিন্তু আত্মজীবনীতে শামসুর রাহমান জানিয়েছেন তিনি প্রথম সন্তানের দুধ কেনার পয়সা জোগাড়ের অপারগতা থেকে চাকরির জন্য দ্বারে দ্বারে ঘুরেছিলেন।

৬. পরবর্তীকালে তাঁর এই ধারণা ভুল বলে প্রমাণিত হয়, তিনি স্বীকারোক্তি দিয়েছেন : 'সাংবাদিকতা সাহিত্যের জাতশত্রু, এই সত্য উপলব্ধি করতে আমাকে অপেক্ষা করতে হলো *দৈনিক পাকিস্তান* পত্রিকার জন্মলগ্ন পর্যন্ত।' (রাহমান, ২০০৪ : ১৫১)

৭. 'এ কেমন বৈরী তুমি' (*ফিরিয়ে নাও ঘাতক কাঁটা*) কবিতায় 'শামসুর রাহমান' বলে নিজেকে সম্বোধন করলেও নামের সূত্র ধরে কবিতায় কোন আত্মজৈবনিকতা বা স্বীকারোক্তিমূলক প্রেক্ষাপট সৃষ্টি হয়নি।

৮. শামসুর রাহমানের মতোইনিজের নাম-পরিচয়, স্বভাব-প্রবৃত্তি উল্লেখ করেন অকপটে,'আমি তাঁর ছেলে প্রথমে হলাম বেকার,/ তারপর বেল্লিক,/ তারপর বেকুব/ এখন লিখি কবিতা/...আমার নাম শহীদ কাদরী/ ছোটো, বেটে – ঝোড়ো নদীতে/ কাগজের নৌকোর মতোই পল্কা/ কাগজের নৌকোর মতোই পল্কা।' ('একটি উত্থান-পতনের গল্প', *কোথাও কোনো ক্রন্দন নেই*)

সহায়কপঞ্জি

জ্যোতিপ্রকাশ দত্ত (২০১৬)। 'নির্বাসন চিরকালই তো দণ্ড'। *অভিবাদন শহীদ কাদরী*, (সম্পাদক : শামসুজ্জামান খান)। বাংলা একাডেমি, ঢাকা।

বিশ্বজিৎ ঘোষ (২০০৬)। 'রাহমানের পঙ্‌ক্তিমালা : কবির কথা কবিতার কথা'। *কালি ও কলম* (সম্পাদক : আবুল হাসনাত), শামসুর রাহমান স্মরণ সংখ্যা, তৃতীয় বর্ষ : নবম সংখ্যা, অক্টোবর।

মণীন্দ্র গুপ্ত (২০১১)। 'ষাট দশকের কবিতা'। *আধুনিক কবিতার ইতিহাস*, (সম্পাদক : অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত, দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়)। দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা।

মাসুদুজ্জামান (১৯৯৩)। *বাংলাদেশ ও পশ্চিম বাংলার কবিতা : তুলনামূলক ধারা*। বাংলা একাডেমি, ঢাকা।

শহীদ কাদরীর কবিতা (২০০৭)। সাহিত্যপ্রকাশ, ঢাকা।

শামসুর রাহমান (২০০৪)। *কালের ধুলোয় লেখা*। অন্যপ্রকাশ, ঢাকা।

শামসুর রাহমান (২০০৫)। *শামসুর রাহমান কবিতাসমগ্র*-১। অনন্যা, ঢাকা।

শামসুর রাহমান (২০০৬)। *শামসুর রাহমান কবিতাসমগ্র*-২। অনন্যা, ঢাকা।

শামসুর রাহমান (২০০৭)। *শামসুর রাহমান কবিতাসমগ্র*-৩। অনন্যা, ঢাকা।

শামসুর রাহমান (২০০৭)। *শামসুর রাহমান কবিতাসমগ্র*-৪। অনন্যা, ঢাকা।

সুশান্ত চট্টোপাধ্যায় (২০১১)। 'সত্তর দশকের কবিতা'। *আধুনিক কবিতার ইতিহাস*, (সম্পাদক : অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত, দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়)। দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা।

হুমায়ুন আজাদ (১৯৮৩)। 'দু'চোখে দুর্গম শিখর'। *শামসুর রাহমান : নিঃসঙ্গ শেরপা*। বাংলা একাডেমি, ঢাকা।